Synopsis of the Thesis

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় সংক্ষেপ

গবেষণার অভিসন্দর্ভের বিষয়

বাংলা নাটকে রাজনৈতিক পটভূমি : বিশ শতকের সাতের দশক

(BANGLA NATOKE RAJNOITIK PATABHUMI: BISH SHATAKER SATER DASHAK)

গবেষক

অমর ভাণ্ডারী

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা নির্দেশক

ড. উত্তমকুমার বিশ্বাস

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ভারত

২০২৩

নাটক কখনোই নিছক শিল্পচর্চার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। ফরাসি বিপ্লবের সময় নাটকের ভূমিকা কীরূপ ছিল তা রম্যাঁ রলাঁ তাঁর ‘পিপলস থিয়েটার’ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় ‘পিপলস থিয়েটারের পূর্বলক্ষণ’-এ বিশদে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক নাট্য অথবা নাটক বলতে যা বোঝায় তার জন্ম হয় বিশ শতকে ইউরোপে এবং তা বিকাশ লাভ করে যাঁদের হাত ধরে তাঁরা হলেন এরউইন পিসকাটর, বের্টল্ট ব্রেখট। আধুনিক রাজনৈতিক নাটক—রাষ্ট্রের শোষণ, নিপীড়নের চিত্র আঁকে, প্রশ্ন করে, শোষিতদের আর্থ-সামাজিক দিক তুলে ধরে তাদের রাজনীতি সচেতন করে, শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের কথা বলে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেয়। নাটক হয়ে ওঠে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার।

বাংলা নাটক প্রথম থেকেই সমাজ পরিবর্তনের যে আন্দোলন তার পাশে থেকেছে, জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। প্রত্যক্ষ রাজনীতি নিয়ে নাটকের যাত্রা প্রগতি আন্দোলন থেকেই শুরু হয়েছে গণনাট্যের মধ্য দিয়ে। পরে একাধিক নাট্য-আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক অভিঘাত ও সামাজিক সংকট তাকে আরও বেশি তরান্বিত করেছে। আমাদের গবেষণার পরিধি সীমিত থেকেছে বিশ শতকের সাতের দশকের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পটভূমিতে রচিত নাটকগুলির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মধ্যে। তবে গবেষণায় আমরা কেবল সাতের দশকের রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে লেখা নাটকগুলিরই আলোচনা করেছি। এখানে মূলত আমরা দেখতে চেয়েছি সমসাময়িক রাজনীতিতে নাটককারদের সক্রিয়তা এবং সমসাময়িক নাটকে সময়ের বিশ্লেষণ ও প্রতিক্রিয়া।

বিশ শতকের সাতের দশকে রাজনৈতিক সংঘাত, অর্থনীতির অবনমন, সামাজিক স্তরের বিশৃঙ্খলা তৎকালীন জনজীবনকে অন্ধকার কুহকে নিক্ষেপ করেছিল। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধির উত্থান, বৈদেশিক কূটনীতিতে তাঁর সফলতা, ‘গরিবি হটাও’ স্লোগান, একাধিক সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও কর্মসূচির ঘোষণা সাধারণ মানুষের মনে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আশা-পূরণে বহুদিক থেকে ইন্দিরা-কংগ্রেসের ব্যর্থতা এবং একের পর এক দুর্নীতি সরকারের প্রতি ক্ষোভের সৃষ্টি করে। সংগঠিত হয় একাধিক গণ-আন্দোলন। সেই ক্ষোভ দমন করতে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বদলে সরকার দমনমূলক পথে এগোয়। ঘোষণা করে জরুরি অবস্থা। MISA (Maintenance of Internal Security Act) আইনের দ্বারা পুলিস প্রশাসনকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। রাজ্য-রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় একাধিক রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল, যা সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে। একদিকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মতাদর্শগত লড়াই, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য প্রত্যেকের মরিয়া প্রয়াস আর অন্যদিকে কংগ্রেসেরও নিজের ক্ষমতাকে ধরে রাখতে আগ্রাসী মনোভাব হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করে। পুলিসের অভিযান, সমাজবিরোধীদের আক্রমণ এবং নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটাতে থাকে একাধিক হত্যা ও হত্যাকাণ্ড। এককথায়, রাজ্যবাসী নির্বিকার চোখে দেখে একটি সন্ত্রাসের দশক।

আমাদের এই গবেষণা কর্মকে যথাযথ রূপদান করার জন্য মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজন করে নিয়েছি। সেই অধ্যায়গুলি এবং তাতে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রথম অধ্যায়

বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ইতিহাস : উদ্ভব থেকে বিশ শতকের ছয়ের দশক

এই অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করেছি রাজনৈতিক নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ভি. আই. লেনিন ও মাও সেতুঙ-এর বক্তব্য, রমাঁ রল্যাঁ-এর 'পিপলস থিয়েটার'-এর ধারণা, এরভিন পিসকাটর ও বের্টল্ট ব্রেখট-এর 'পলিটিক্যাল থিয়েটার'-এর দার্শনিক দিক।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে বাংলা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা মৌলিক নাটক রচনার প্রয়াস চলেছে। মধুসুদন দত্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের হাতে বাংলা নাটক নিজস্ব সংরূপ গঠন করতে সক্ষম হয়। এই সময় সমাজ-সংস্কার আন্দোলন বাংলার সমাজে প্রবলভাবে চলেছে। যেগুলির বেশিরভাগই সংগঠিত হয়েছিল সামাজিকভাবে নারীদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের উদ্যোগে সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তি (৪ ডিসেম্বর ১৮২৯) এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন (২৬ জুলাই ১৮৫৬) ঘটে। এছাড়াও বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কুলীনপ্রথা রদ করার জন্য সে সময় জনমত সংগঠিত হয়। সে সময়ের বাংলা নাটককাররাও সে সব বিষয় নিয়ে একাধিক উদ্দেশ্যপ্রধান নাটক রচনা করেন। এই আন্দোলনগুলি এক অর্থে ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করে পুনর্গঠন করা; সে অর্থে এই নাটকগুলিও কিছুটা রাজনৈতিক। তবে রাজনৈতিক নাটকের যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ রাষ্ট্রের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জনমত গঠন করা—তা এই নাটকগুলিতে ছিল না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ব্রিটিশ সরকারের শোষণের দিক প্রথম তুলে ধরা হল নীলচাষকে কেন্দ্র করে দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকে। সে পথ অনুসরণ করে রচিত হয় একাধিক 'দর্পণ' নাটক।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সিপাহী বিদ্রোহ সহ একাধিক বিদ্রোহ এবং ব্রিটিশ বিরোধী জনমতো সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৬৭ সাল থেকে হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী হাওয়া বইতে শুরু করে। ফলে সমাজ-সংস্কারমূলক নাটকের গতি জাতীয়তাবাদী নাটক রচনার দিকে মোড় নেয়। আবির্ভাব ঘটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের। প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২)। কিন্তু এগুলি ছিল মূলত ঐতিহাসিক এবং হিন্দু গৌরব গাথার নাটক। সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা এতেও ছিল না। সেদিক থেকে এই সময় উপেন্দ্রনাথ দাসের রচিত 'শরৎ সরোজিনী' (১৮৭১), 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫) ও 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' (১৮৭৬) তিনটি নাটক প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিরোধিতা করে রচিত। এখানেই বাংলা রাজনৈতিক নাটকের বিশেষ রূপ ধরা পড়ে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্রিটিশ শাসক 'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' (১৮৭৬) চালু করে সেই পথ বন্ধ করে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসক একাধিক জনবিরোধী আইন চালু ও নিপীড়ন করলে এবং ভারতীয়দের একাধিক ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ ও রাজনীতির প্রচার চললেও বাংলা নাটকে তার কোনও প্রতিফলন পড়েনি।

পরবর্তীতে বাংলা নাটক পুনরায় রাজনীতিমুখী হল ধর্মের ভিত্তিতে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ও তার প্রতিবাদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। পুনরায় রচিত হতে থাকল একাধিক ঐতিহাসিক স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক। যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌল্লা' (১৯০৫) ও 'মীরকাশিম' (১৯০৬), অমৃতলাল বসুর 'নবজীবন' (১৩০৮), 'সাবাস বাঙ্গালি', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'চন্দ্রগুপ্ত'

(১৯১১), 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩), 'পলাশির প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭), 'নন্দকুমার' (১৯০৮), 'বাংলার মসনদ' (১৯১০), অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ', সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালী পল্টন' ইত্যাদি নাটক।

এর পরেই ভারত ও বিশ্ব রাজনৈতিক পরিবেশে অনেক সংকট দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, জাতীয়তাবোধের প্রতি সংশয়, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা, মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের বিস্তার, ভারতে মহাত্মা গান্ধির আগমন ও তাঁর নেতৃত্বে দেশব্যাপী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ (১৯২০-১৯২২) ও আইন-অমান্য (১৯৩০) আন্দোলন। এরকম সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন যন্ত্রের ভয়াবহ শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে 'মুক্তধারা' (১৯২২), ধনতন্ত্রী শোষণের বিরুদ্ধে 'রক্তকরবী' (১৯২৬), সামাজিক শ্রেণি-বৈষম্যের বিরুদ্ধে 'রথের রশি' (১৯৩২) নাটক। এই সময় নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটে মন্মথ রায় ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাঁদের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দেশাত্মবোধ, আধুনিক মানুষের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে।

এই শতকের তিনের দশকে জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলার ও ইতালিতে মুসোলিনির উত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান ঘটে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশনি-সংকেত ধ্বনিত হয়। ফ্যাসিবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে রম্যাঁ রলাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি, আঁরি বারবুস-এর আহ্বানে বিশ্বের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা একজোট হন। বাংলা তথা ভারতের বুদ্ধিজীবীরাও সেই আহ্বানে সাড়া দেন। মুন্সী প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' (All India Progressive Writers' Association)। সেই ইশতেহারে বলা হয়, বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করার কথা। এরপর ১৯৪০ সালে Youth Cultural Institute (YCI), ১৯৪১ সালে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি', 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গণনাট্য সংঘ'।

চারের দশকে দেখা দিল ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ভারতে সংগঠিত হল 'ভারত ছাড়ো' (১৯৪২) আন্দোলন, ভারতের আকাশে জাপানি আক্রমণের সংকট, পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে বাংলায় মারা গেল তিরিশ লক্ষেরও অধিক মানুষ, কালোবাজারির রমরমা, সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভ্যুত্থান, জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার পরমাণু বোমা নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা, বাংলায় 'ছেচল্লিশের দাঙ্গা', ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। এসমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু নাটক রচিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' (১৯৪৪), তুলসী লাহিড়ী 'দুঃখীর ইমান' (১৩৫৪), 'ছেঁড়া তার', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'দীপশিখা' ইত্যাদি নাটক রচনা করেন। সাম্প্রদায়িকতা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা এসে ধরা দিল দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭), 'মশাল' (১৯৫৪), তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি', সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' (১৯৫৩), পানু পালের 'ভাঙ্গা বন্দর' (১৯৫১) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' ইত্যাদি নাটকে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কুড়ি বছরে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকট পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পরবর্তী নাটকে স্বাধীনতার আশাভঙ্গের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টি শ্লোগান তোলে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যা'। কৃষক-শ্রমিকদের সমস্যা দেখা দেয়; গড়ে ওঠে তেভাগা, তেলেঙ্গানা আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয় স্বাধীন ভারতে। দেশে খাদ্যসংকট ঘনীভূত হলে ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলন হয়। ১৯৬২ সালে চিন-ভারতের যুদ্ধ এবং ১৯৬৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন ঘটে। বিশ্ব-ইতিহাসে আমেরিকার ভিয়েতনাম আক্রমণ (১৯৬৫), চিনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৬৬) এবং ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলন (১৯৬৮) অন্যতম ঘটনা। এই সমস্ত ঘটনা স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা নাটকে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এছাড়াও গ্রুপ থিয়েটারের রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক, মতাদর্শ নাটকে ধরা দিয়েছে। নাটকের মধ্যে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে শ্রমিক-কৃষকের সমস্যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মন্মথ রায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, বাদল সরকারের একাধিক নাটকে স্বাধীনতা-পরবর্তী সমস্যা ও সংকট উঠে এসেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাতের দশকের রাজনৈতিক পটভূমি

গবেষণার এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্র ও রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ) রাজনীতির উত্থান-পতন। আলোচনার সুবিধার্থে অধ্যায়টিকে দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছি—

প্রথম পরিচ্ছেদ : কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রেক্ষিত

কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধি প্রথমদিকে অনভিজ্ঞ ও পার্টি 'বস'-দের দ্বারা চালিত হতেন। কিন্তু তিনি নিজেকে চতুর্থ ও পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেকে দেশের একমেবদ্বিতীয়ম্ নেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৬৭-১৯৭১ সালের মধ্যে। পূর্ব-পাকিস্তানের উপর পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে নিজেদের স্বাধীন করতে ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালি জনগণ 'মুক্তিযুদ্ধ' ঘোষণা করে। যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এনে দেয় ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর। এখানে ভারতের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য, ইন্দিরা গান্ধির বৈদেশিক কূটনীতি, প্রাণ বাঁচাতে ভারতে নিরাপত্তার সন্ধানে আগত বাঙালিদের আশ্রয় দান এবং সর্বোপরি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ভারত। এই জয় যতটা বাংলাদেশের ছিল, ভারতেরও ছিল ততটাই। বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধির। যার সুযোগ নিয়ে ১৯৭২ সালে একাধিক রাজ্যের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস জয়যুক্ত হয় এবং সারা দেশে একচ্ছত্র ইন্দিরা গান্ধির ক্ষমতা বলীয়ান হয়। নিজের কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে একাধিক আইন প্রণয়ন করে, এমনকি বিচার-ব্যবস্থাকেও নিজের করায়ত্ত করতে চান। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাতে প্রথম ধাক্কা দেয় রাজনারায়ণ কেসের ওপর ভিত্তি করে ১৯৭৪ সালের এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়। যে রায়ে ১৯৭১ সালে রায়বেরিলি লোকসভা আসনে ইন্দিরা গান্ধি ভোটে জয়ী হতে কারচুপি করেছিলেন বলে প্রমাণিত হলে ইন্দিরা গান্ধির লোকসভা আসন বাতিল হয়ে যায়। অপরদিকে দেশীয় অর্থনীতির বেহাল দশা জনগণকে ক্রমশ ইন্দিরা-বিমুখ ও আন্দোলনমুখী করে তোলে।

গুজরাটের 'নবনির্মাণ আন্দোলন' (১৯৭৩) ও বিহারের আন্দোলন (১৯৭৪) থেকে ক্রমশ সারা ভারতে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত হয়। যার নেতৃত্ব দেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। যা 'জে. পি. আন্দোলন' নামেও পরিচিত। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ইন্দিরা গান্ধিকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা।

রাজনীতির এরকম চক্রব্যূহে পড়ে নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে শেষপর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধি 'জাতীয় জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেন ২৬ জুন ১৯৭৫ সালে এবং তা বহাল থাকে ২১ মার্চ ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মোট ২১ মাস। এই সময় 'MISA' ও 'The Defence of Indian Act, 1971' আইনের মাধ্যমে নির্বিচারে গ্রেপ্তার চলে। 'পরিবার পরিকল্পনা'-এর নামে চলে নির্মম নির্বীজকরণ, নগর সৌন্দর্যায়নের নামে চলে বস্তি উচ্ছেদ। একরকম 'ডিকটেটরশিপ' কায়েম হয় সারা দেশে। এমারজেন্সির পরে নির্বাচন ঘোষণা হলে ইন্দিরা গান্ধির পরাজয় ঘটে এবং জনতাদল সরকার গঠন করে। মোরারজী দেশাই দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সাতের দশকের যে জটিলতা তার সূত্রপাত হয় ছয়ের দশকে। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, প্রশাসনিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শগত সংঘাত, কংগ্রেস সরকারের একের পর এক ব্যর্থতা সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে। এরকম পরিস্থিতিতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন (১৯৬৭) হয়। গঠন হয় অ-কংগ্রেসি প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। ১৮ দফা কর্মসূচিতে সাধারণ জনগণের আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক মানোন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতা, অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির আন্তঃপার্টি সংগ্রাম নকশাল আন্দোলনের জন্ম দেয়। উত্তরবঙ্গে চারু মজুমদারের লিখিত আটটি দলিল ও কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, সৌরেন বসুদের সশস্ত্র কৃষক-বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রচার এবং অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, অসিত সেন, পরিমল দাসগুপ্ত, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুনীতিকুমার ঘোষ প্রমুখের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে একটি বিতর্কমূলক আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রাম রাজনৈতিক অস্থিরতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। ২৫ মে ১৯৬৭-এর নকশালবাড়িতে পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনা তাতে ইন্ধন দেয়।

এরকম পরিস্থিতিতে শরিক দলের কোন্দলে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে ২১ নভেম্বর ১৯৬৭ সালে এবং কংগ্রেসের সমর্থনে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে পি. ডি. এফ. (পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) সরকার গঠন হয় ২২ নভেম্বর। কলকাতায় জারি হয় ১৪৪ ধারা। অবশেষে ২০ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলে পুনরায় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হয়। এই সময় রাজ্যজুড়ে প্রবলভাবে চলছে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন। নকশাল আন্দোলন তখন সর্বোচ্চ শিখরে। ১ মে শহীদ মিনারে এক সমাবেশে নকশালরা সি. পি. আই. (এম. এল.) গঠন করে। পুলিশ এই সময় খুব তৎপর হয়ে ওঠে। নকশালদের 'শ্রেণিশত্রু' খতমের অভিযান এবং 'সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন' ইত্যাদি প্রচার পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তোলে। একাধিক জায়গায় জোতদার, মহাজন, জমিদাররা খুন হতে থাকে। ছাত্র-যুবরাও তার সঙ্গ দেয়।

১১ মার্চ ১৯৭২ সালে নির্বাচনে কংগ্রেস জয়যুক্ত হয়; সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী হন। নির্বাচনের সময় চলে ব্যাপক সন্ত্রাস-রিগিং। জ্যোতি বসুও পরাজিত হন। ১৯ মার্চ সি. পি. আই. (এম)-এর রাজ্য কমিটি থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে আরও 'কঠিন অগ্নিপরীক্ষা'-র জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়। কংগ্রেস-সি. পি. আই. (এম)-এর সংঘাত হয়ে দাঁড়ায় রাজ্য-রাজনীতির পরবর্তী পর্যায়। ১৯৭১ থেকেই কংগ্রেসি গুন্ডাদের অত্যাচার রাজ্যে বাড়তে থাকে। এই সময় তা আরও প্রবল হয়; পুলিস ও সি. আর. পি.এফ তাদের সাহায্য করে। রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসী আবহাওয়ায় সি. পি. আই. (এম)-এর বহু পার্টি-অফিস দখল এবং নেতা-কর্মী-সমর্থকরা হত-আহত-গ্রেপ্তার-এলাকা ছাড়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-কারখানাগুলিতেও শ্রমিক-অসন্তোষ বাড়তে থাকে। লক-আউট, লে-অফ, ছাঁটায়ের বিরুদ্ধে এবং বোনাসের দাবিতে ঘেরাও, শ্রমিক-ধর্মঘট ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এই বছর সারা ভারতে রেল ধর্মঘট হলে বহু রেলকর্মী গ্রেপ্তার হয়—পশ্চিমবঙ্গেই হয় সব থেকে বেশি। এই সময়পর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন; গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রায় লুপ্ত।

১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলে এই অবস্থার উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পায়। জরুরি অবস্থা জারির পরামর্শ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ৮ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালেই চিঠি মারফত ইন্দিরা গান্ধিকে দিয়েছিলেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির একাধিক নেতা গ্রেপ্তার হয়, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক গৌরকিশোর ঘোষ গ্রেপ্তার হন। থিয়েটারের ওপর নেমে আসে সন্ত্রাসের ছায়া। ১৯৭৭-এ জরুরি অবস্থা অবসানের পর কেন্দ্রের মতো রাজ্যেও কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে—জয়ী হয় সি. পি. আই. (এম)।

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের নাটকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন

১৯৪৭ সালে দেশভাগ করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালে গিয়ে পাকিস্তান পুনরায় বিভাজিত হয়ে পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়। স্বাধীনতার পর থেকেই এর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। যার পিছনে মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের দ্বারা পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণ এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। পূর্ব-পাকিস্তান (বাংলাদেশ)-এর প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তান সর্বত্র ঔপনিবেশিক শাসকের মতো আধিপত্য করেছে। তাদের ভাষার স্বাধীনতা খর্ব করেছে, মৌলিক অধিকার দমন করেছে, অর্থনৈতিক সাহায্যে বৈষম্য দেখিয়েছে, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতেও বাধা দিয়েছে। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি মুসলিমদের পশ্চিম-পাকিস্তানের পাঞ্জাবি মুসলিমদের প্রতি ক্ষোভ জন্ম নেয় অনেক আগে থেকেই—১৯৫২ সালে ভাষার স্বাধীনতা অর্জনে সংগঠিত হয় রক্তক্ষয়ী 'ভাষা আন্দোলন'। আর এই ক্ষোভের শেষ পরিণতি হয় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ নিয়ে আমাদের গবেষণা সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চার মধ্যে আবদ্ধ। বর্তমান অধ্যায়েও আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের যে সব নাটকে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে সেই নাটকগুলির মধ্যে সীমিত। আমরা আলোচনা করেছি উৎপল দত্তর 'ঠিকানা' ও 'জয় বাংলা', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়র 'দুরন্ত পদ্মা',

স্বপন কুমার মিত্রর ‘মুক্তির রাইফেল’ এবং পানু পালের ‘বাঁচার শপথ’, অনিল দের ‘দূর্বার বাংলা এই ছয়টি নাটক। এই নাটকগুলিতে মূলত ধরা পড়েছে—

প্রথমত, বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর পাকিস্তানি সেনার অত্যাচার;

দ্বিতীয়ত, তার প্রতিরোধ গড়তে বাংলাদেশের নাগরিকদের সশস্ত্র সংগ্রাম;

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের নাগরিকদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা;

চতুর্থত, নারী নির্যাতন এবং

পঞ্চমত, বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি ভারতের সহানুভূতি ও সাহায্য;

এছাড়াও আর একটি বিষয় ধরা পড়েছে—বাংলাদেশের জোতদার, জমিদারদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রয়াস। এর পিছনে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত বাংলা নাটক

বিশ শতকের সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতিতে সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল নকশাল আন্দোলন। নকশাল আন্দোলন নিয়ে লেখা নাটকগুলি থেকে কিছু নাটক নির্বাচিত করে আমাদের এই অধ্যায় সমাপন হয়েছে। আমাদের গবেষণার এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে উৎপল দত্তের ‘তীর’, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘রাজরক্ত’, বিজন ভট্টাচার্যের ‘চলো সাগরে’, অসিত বসুর ‘কলকাতার হ্যামলেট’, অমল রায়ের (আসল নাম তপন দাস) ‘দালাল’, ‘আটজোড়া খোলা চোখ’, ‘দুই চোরের গপ্পো’, ‘পঙ্কজ দত্ত আসছেন’, ‘যেখানেই অত্যাচার’, মনোরঞ্জন বিশ্বাসের ‘পদাতিক’, সমীর চক্রবর্তীর ‘স্টেডিয়াম নেই, হাততালি নেই’, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মেঘের আড়ালে সূর্য’, নিরূপ মিত্রের ‘অজ্ঞাতনামা’, শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের ‘ঝড়ের পাখি’, বাদল সরকারের ‘ভোমা’, ‘নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র’।

২৫ মে ১৯৬৭ সালে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি অঞ্চলে সাধারণ কৃষক, কৃষক রমণী ও শিশুদের ওপর পুলিশের নির্মম গুলি চালানোর ঘটনা অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তৎকালীন নাটককারদেরও সহানুভূতিসম্পন্ন ও প্রতিবাদমুখর করে তুলেছিল। ‘তীর’ (১৯৬৭) নাটকে নাটককার জোতদার কর্তৃক কৃষকদের শোষণ, কৃষকদের আর্থিক অবস্থা, তাদের সংগ্রাম ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের কারণ তুলে ধরেছেন। এছাড়াও নকশালবাড়ি আন্দোলনে মাও সেতুঙ-এর চিন্তার বাস্তব প্রয়োগ এবং চারু মজুমদারের আটটি দলিলের নির্যাসকে স্থান দিয়েছেন। নকশাল আন্দোলনকে দমন করার হিংসাত্মক নানা প্রয়াস সরকার করেছে পুলিস ও পোষা গুন্ডাদের দিয়ে। নকশাল আন্দোলনের উত্থান ঘটেছিল ছয়ের দশকে; আর ১৯৭২ সাল নাগাদ এই আন্দোলন দমিত হয়ে যায় চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত প্রমুখের হত্যা এবং বারাসাত-কাশীপুর-বরাহনগর ইত্যাদি গণ-হত্যাকাণ্ডের মধ্য

দিয়ে। সে জন্যই সাতের দশকে নকশাল আন্দোলনকে নিয়ে রচিত নাটকগুলিতে সরকারি দমনের চিত্র এবং রাজনীতির ঋণাত্মক দিকগুলি উঠে এসেছে। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অসিত বসু লেখেন ‘কলকাতার হ্যামলেট’ (১৯৭৩)। অমল রায়ের সমস্ত নাটকেই নকশাল রাজনীতির সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ তিনি রাজনীতির এই লাইনকে বিশ্বাস করেছেন সারাজীবন। ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে নকশাল আন্দোলনের সংগ্রামকে একাত্ম করে দেখেছেন ‘দালাল’ নাটকে, বারাসাতের গণহত্যাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন ‘আট জোড়া খোলা চোখ’, জেলের রাজনীতি উঠে এসেছে ‘দুই চোরের গপ্পো’ নাটকে, সরোজ দত্তর মৃত্যুকে নিয়ে লিখেছেন ‘পঙ্কজ দত্ত আসছেন’, কাশীপুর-বরানগর হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে ‘যেখানেই অত্যাচার’ নাটকটি লেখা।

জোতদার ও প্রশাসনের সখ্য, কৃষক সমাজের দুর্দশা এবং তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম ধরা পড়েছে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের ‘পদাতিক’ নাটকে। শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের ‘ঝড়ের পাখি’ নাটকে আছে যুব সমাজের সংকট ও নকশাল আন্দোলনকে ছাত্র-যুবদের সমর্থন। বাদল সরকারের নাটকে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব সেরকম প্রত্যক্ষভাবে আসেনি, এসেছে পরোক্ষভাবে। এই সময় রচিত তাঁর সমস্ত নাটকেই শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে সমসাময়িক রাজনীতির গতি-প্রকৃতিও ধাক্কা দিয়েছে তাঁর নাট্যচেতনায়। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিও বারবার উঠে এসেছে সে সব নাটকে। ‘ভোমা’ নাটকে শোষিত, নিপীড়িত সেই সব মানুষের কথা বলা হয়েছে যাদের দিন কাটে ক্ষুধার জ্বালায়। তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে এবং নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পন্থাকে সমর্থন করা হয়েছে। ‘নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র’ নাটকে রাজনৈতিক নেতাদের চতুরতা, শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বার্থপরতা এবং কৃষকদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। মহাভারতের বিষয় নিয়ে মনোজ মিত্র লিখলেন ‘অশ্বত্থামা’। নকশাল আন্দোলনের গতি তখন স্তব্ধ; কিন্তু তখনও তার মূল্যায়ন বাকি। সেই মূল্যায়ন ধরা দিল এই নাটকে। আর নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক লাইনের বিরোধিতা করে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন ‘মেঘের আড়ালে সূর্য’।

পঞ্চম অধ্যায়

সাতের দশকের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চিত্র বাংলা নাটকে

সাতের দশকের রাজনীতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়েছিল রাজনৈতিক সন্ত্রাস। রাষ্ট্রপতি শাসন, কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের পর রাজনৈতিক পরিবেশ আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বেকারত্ব, রাজনৈতিক হিংসা, গ্রেপ্তার ছিল এই সময়ের চরম সত্য। বাংলা নাটকে তার প্রতিফলন পড়েছে চরমভাবে। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি উৎপল দত্তের ‘ব্যারিকেড’, ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’, বাদল সরকারের ‘মিছিল’, ‘বাসি খবর’, অমল রায়ের ‘লাসবিপণি’, ‘শববাহকেরা’, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হে সময়, উত্তাল সময়’, অসিত ঘোষের ‘সংগ্রাম’, ‘নাজি ’৭৪’।

জার্মানে হিটলারের অভ্যুত্থানে যে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেই পটভূমিতে ‘ব্যারিকেড’ রচিত। এখানে তিনের দশকের জার্মান হয়ে উঠেছে সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গ। সাতের দশকের কলকাতায় যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেই পটভূমিতে রচিত ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’। ‘মিছিল’ নাটকে বাদল সরকার সেই ‘সত্যি মিছিল’-এর অপেক্ষা করেছেন যা সঠিক পথ দেখাবে, এই হানাহানি থেকে মুক্তি দেবে। ‘বাসি খবর’-এ ধরা পড়ে জেলের ভিতর পুলিশের অত্যাচার। অমল রায় ‘লাসবিপণি’-নাটকে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র কীভাবে শোষিত-নিপীড়িত হচ্ছে তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ‘জাতীয় উন্মাদাশ্রম’ নাটকে ধরা পড়েছে বেকারত্বের চিত্র। ‘নাজি ’৭৪’ নাটকে কংগ্রেসি গুন্ডাদের অত্যাচার ও সমসাময়িক রাজনৈতিক চিত্র ধরা পড়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা নাটকে জাতীয় জরুরি অবস্থার পটভূমি

কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত সাতের দশকের জাতীয় জরুরি অবস্থা দেশের জাতীয় জনজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মৌলিক অধিকার খর্ব, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, সেনসরশিপ, পরিবার পরিকল্পনার নামে অপরিকল্পিত নির্বীজকরণ হয়ে ওঠে অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা। সমস্ত কিছুর উপর চলে সরকারী নজরদারি। নাটক ও থিয়েটার তার বাইরে থাকে না। নাটককারেরা নাটক অভিনয় করতে গিয়ে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হন। ফলে জরুরি অবস্থার পটভূমিকে বিষয় করে খুব বেশি নাটক রচনা ও পরিচালনার সুযোগ সেই সময়ে হয়নি; তবে একেবারেই যে লেখা হয়নি তা নয়। এমন বেশকিছু নাটক পাওয়া যায় যেগুলি জরুরি অবস্থার জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছে এবং তার প্রতিবাদও করেছে।

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি উৎপল দত্তের ‘লেনিন কোথায়?’, ‘এবার রাজার পালা’, ‘সাদা পোশাক’, অমল রায়ের ‘নিজবাসভূমি’, ‘বদলা’, দিব্যেশ লাহিড়ীর ‘নানা হে’, মনোজ মিত্রের ‘নরক গুলজার’, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উত্তর মেলে না’, অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘দেশটা যখন কারাগার’, অসীম মৈত্রর ‘ঢাকের বাদ্যি’।

উৎপল দত্ত জরুরি অবস্থার স্বৈরাচারী শাসনকে লক্ষ করে শেক্সপিয়ারের ‘ম্যাকবেথ’ পরিচালনা করেছেন; নভেম্বর বিপ্লবের (১৯১৭) পূর্বে কেরেনস্কি সরকার শাসিত রাশিয়ার জটিল রাজনৈতিক পটভূমিকে বিষয় করে জরুরি অবস্থার ভারতের স্বরূপ দেখিয়েছেন উৎপল দত্ত ‘লেনিন কোথায়?’ নাটকে; আবার যাত্রার আঙ্গিকে ১৯৪৬ সালের ভারতীয় পটভূমিতে রচিত ‘এবার রাজার পালা’ নাটকে জরুরি অবস্থার একনায়কতন্ত্রী রূপ; ‘সাদা পোশাক’ নাটকে উঠে আসে সরাসরি জরুরি অবস্থার কাহিনি। অমল রায়ের ‘নিজবাসভূমি’, ‘ঝড় উঠুক’, ‘বদলা’ নাটকগুলিতে আছে জরুরি অবস্থার হিংসাত্মক রূপ ও দমনের চিত্র। এই সময় গম্ভীরা লোকশিল্পীরাও বেশকিছু প্রতিবাদমূলক কর্মসূচি করেছিল। যার ফলে তাদেরকেও পড়তে হয় পুলিশি নজরদারিতে এবং সরকারি ক্ষোভে। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে দিব্যেশ লাহিড়ীর রচনা করেন ‘নানা হে’ নাটক। আকাশবাণী ও কিছু সংবাদমাধ্যম এই সময় প্রতিবাদের পথে না গিয়ে ইন্দিরা গান্ধির প্রচারমাধ্যমে পরিণত হয়েছিল। এই প্রতিবাদ বিমুখতাকে

আক্রমণ করে অসীম মৈত্র লেখেন ‘ঢাকের বাদ্যি’। এছাড়াও বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উত্তর মেলে না’, অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘দেশটা যখন কারাগার’, মনোজ মিত্রের ‘নরক গুলজার’ নাটকগুলিতে জরুরি অবস্থা উঠে এসেছে।

উপসংহার

পূর্বে আলোচিত ছয়টি অধ্যায়ের বক্তব্য থেকে প্রাপ্ত সাতের দশকের রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত নাটকগুলি কোথায় নিজের স্বাতন্ত্র্য ও সফলতা বজায় রেখেছে সেই বিষয়টি এখানে আলোচিত হবে। শিল্পীর শিল্পসত্তা যে কোনও রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা করে না তার প্রমাণ রেখেছেন সাতের দশকের নাটককারররা। স্বাধীনতা অর্জনের পরেও যখন পরাধীন ভারতবর্ষের অনুরূপ সংকট আমাদের জনজীবনে দেখা দিল তখন সেই আশাভঙ্গ হয়েছে। আর আশাভঙ্গের প্রকাণ্ড রূপ ধরা পড়ে সাতের দশকের রাজনৈতিক পরিবেশে। স্বাধীন ভারতে প্রথম অনুভূত হল পরাধীনতার গ্লানি। বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে সংঘাত বিভ্রান্ত করেছিল জনজীবনকে। এরকম পরিস্থিতেও নাটককারেরা চুপ করে বসে থাকেনি। তারা প্রতিবাদ করেছে নিজেদের দক্ষতায়। ফলে শাসক ভয় পেয়েছিল। সেজন্যই শাসক বারবার আক্রমণ করেছে। তবে এখানে এটা উল্লেখ না করলেই নয় যে এই সময় বেশিরভাগ নাটকই রচিত হয়েছিল মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং কংগ্রেস বিরোধিতাই সেখানে প্রকট হয়েছে। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে রচিত নাটক এই সময় বিশেষ পাওয়া যায় না। যা রাজনৈতিক নাটকের আর একটি দিক। নকশাল আন্দোলনের সর্বনাশা রূপ যখন ধরা পড়ছিল তখনও কিছু নাটককার নকশালদের হত্যার রাজনীতিকে সমালোচনা না করে বরং সমর্থনই করে গেছেন। আবার সি. পি. আই. (এম)-এর আদর্শ ভঙ্গ করে বিপরীত আদর্শের দলের সঙ্গে জোট বেঁধে যখন সংসদীয় ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে মশগুল থেকেছে সেই দিকটিরও সমালোচনা তেমন কোথাও নেই। আসলে এই সময় কংগ্রেসই হয়ে উঠেছিল মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, সেহেতু কংগ্রেসের একপাক্ষিক সমালোচনায় ছিল নাটকের মূল লক্ষ্য।